গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৪ বর্ষ ১৬ সংখ্যা | ২৬ নভেম্বর - ২ ডিসেম্বর ২০২১ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ২ টাকা | পৃ. ১

হ্যাঁ, গণআন্দোলনই পারে

সঙ্ঘবদ্ধ কৃষকদের অনমনীয় দৃঢ়তার সামনে শেষ পর্যন্ত নতি স্বীকারে বাধ্য হল বিজেপি সরকার। জোড় হাতে ক্ষমা ভিক্ষা করে প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করলেন, নয়া কৃষিআইন তুলে নিচ্ছে সরকার। জয়ী হল কৃষকদের টানা এক বছরের ঐতিহাসিক লড়াই।

এ জয় ঐতিহাসিক। ঐতিহাসিক নানা কারণে। কৃষকদের প্রতিপক্ষ হিসাবে ছিল রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন বিজেপির মতো একটি কেন্দ্রীভূত, ফ্যাসিস্ট দল যে গণতান্ত্রিক রীতিনীতিকে দু-পায়ে মাড়িয়ে চলেছে। লাগাতার এক বছর ধরে অনেকগুলি কৃষক সংগঠনকে একত্রিত রেখে আন্দোলনকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া-ও সহজ কাজ ছিল না। তথাকথিত বড় দলগুলির কোনও রকম সাহায্য ছাড়াই জনসাধারণের নিজস্ব শক্তির জন্ম দিয়ে জয় ছিনিয়ে আনা স্বাধীন ভারতের গণআন্দোলনের ইতিহাসে বিরল।

কৃষক আন্দোলনের প্রবল চাপে সরকার পিছু হঠল। কিন্তু এত দেরিতে কেন? আন্দোলনকে কেন্দ্র করে প্রায় সাতশো কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। এর তো কোনও প্রয়োজন ছিল না। এই এক বছর কৃষকরা তাঁদের ঘর-সংসার, পরিবার, জীবিকা, চাষাবাস সব ফেলে রেখে দিল্লির সীমানায় তাঁবুর মধ্যে কাটিয়ে দিয়েছেন। ঝড়বৃষ্টি, প্রবল শীত, গ্রীষ্ম, সরকারের প্রবল চাপ, পুলিশের লাঠি, মিথ্যা মামলা, বিজেপি কর্মী-গুন্ডাবাহিনীর লাগাতার হামলা সহ্য করেছেন।

সরকারের ঘোষণায় কৃষকদের সাথে সারা দেশবাসী উল্লসিত। কিন্তু শুধু কৃষিআইন প্রত্যাহারই তো কৃষকদের দাবি ছিল না। ফসলের ন্যায্য দাম না পাওয়া

চারের পাতায় দেখুন

কৃষি আইন প্রত্যাহারের ঘোষণার পরেই ১৯ নভেম্বর কলকাতায় দলের বিজয় মিছিল

অভিনন্দন
এস ইউ সি আই (সি)-র

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ১৯ নভেম্বর এক বিবৃতিতে কৃষি আন্দোলনকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেছেন, ফ্যাসিস্ট বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকারকে শেষ পর্যন্ত সংগ্রামী কৃষকদের কাছে নতিস্বীকার করতে হল ও তাদের ন্যায্য দাবিগুলি মেনে নিতে হল। ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলনের এ এক বিরাট জয়। যা আবার প্রমাণ করল নির্ভীক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মেহনতি মানুষের দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলনই কেবল পুঁজিপতি শ্রেণি ও মাল্টিন্যাশনালদের সেবাদাস শাসক দলগুলির সমস্ত রকম জনবিরোধী ষড়যন্ত্রমূলক পরিকল্পনাকে পরাস্ত করতে পারে। শোষিত নিপীড়িত সকল জনগণের কাছে এ এক মহৎ শিক্ষা।

কৃষক আন্দোলনের সকল শহিদদের প্রতি আমরা লাল সেলাম ও সংগ্রামী কৃষকদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

স্বাস্থ্যসাথী ঃ চ্যালেঞ্জের মুখে বিনামূল্যের চিকিৎসা

২৫ অক্টোবর রাজ্য স্বাস্থ্যদপ্তর এক নির্দেশনামায় ঘোষণা করেছে, এখন থেকে সরকারি হাসপাতালে ভর্তির ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড বাধ্যতামূলক। যারা চাকরিজীবী তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য স্বাস্থ্যকার্ড যথা পশ্চিমবঙ্গ হেলথ স্কিম, কেন্দ্রীয় সরকার হেলথ স্কিম, ইএসআই ইত্যাদি হেলথ কার্ডগুলি দাখিল করা বাধ্যতামূলক। অর্থাৎ এই কার্ড যাদের নেই তারা আর সরকারি হাসপাতালে ভর্তির সুযোগ পাবেন না।

সরকারি হিসাব অনুযায়ী এ পর্যন্ত ২ কোটি ৩০ লক্ষ মানুষের হাতে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড রয়েছে এবং খুবই সীমিত সংখ্যক মানুষ যারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে চাকরি করেন তাঁরা অন্যান্য স্বাস্থ্যকার্ডের সুযোগ পেয়ে থাকেন। যদিও এই নির্দেশিকায় বলা আছে যাদের স্বাস্থ্যসাথী কার্ড নেই তাদের জন্য হাসপাতাল কর্তৃপক্ষই কার্ড তৈরি করে দেবে, তারপরে তার ভর্তির ব্যবস্থা করা হবে। এই কার্ডের বিনিময়ে যে কোনও মানুষই তার পরিবারের সকল সদস্যের জন্য বছরে ৫ লক্ষ টাকার চিকিৎসা বিনা অর্থ ব্যয়েই পাবেন বলে সরকারি ঘোষণা।

স্বাস্থ্যসাথী কার্ড এ রাজ্যে ২০১৬ থেকেই চালু হয়েছে। কেন্দ্রের আয়ুষ্মান ভারতের সমান্তরাল এই প্রকল্পটি কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই চালু হয়েছে। প্রথম দিকে নির্দিষ্ট কিছু পেশার মানুষ এই কার্ডের সুযোগ পেতেন। ২০২০-র ডিসেম্বর থেকে এই সুযোগ কিছু চাকরিজীবী ছাড়া রাজ্যের সব মানুষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হয়েছে।

স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পটি কী? এটি আসলে একটি বিমানির্ভর স্বাস্থ্য প্রকল্প। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি গোটা দেশ জুড়ে যেমন চালু করেছেন আয়ুষ্মান ভারত স্বাস্থ্য প্রকল্প, তেমনই এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী চালু করেছেন স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্প।

দুয়ের পাতায় দেখুন

রাজ্যে চাকরির পরীক্ষায় ব্যাপমের মতো দুর্নীতি

রাজ্যে স্কুল সার্ভিস কমিশনে অশিক্ষক কর্মচারী নিয়োগের পরীক্ষায় চরম দুর্নীতির প্রতিবাদে পথে নামল অল ইন্ডিয়া ডি ওয়াই ও। সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক কমরেড মলয় পাল ১৯ নভেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন, শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে কাটমানির অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরেই উঠছিল। সেই অভিযোগের সত্যতা আবারও প্রমাণিত হল হাইকোর্টের তিরস্কারে।

ছয়ের পাতায় দেখুন

বিক্ষোভ ডিওয়াইও-র

যুব বিক্ষোভ, বেলদা পশ্চিম মেদিনীপুর

চ্যালেঞ্জের মুখে বিনামূল্যের চিকিৎসা

একের পাতার পর

প্রকল্পে বলা হয়েছে পরিবার পিছু ১ বছরের জন্য ৫ লক্ষ টাকার চিকিৎসা পরিষেবা বিনা অর্থেই পাবেন। এর জন্য তারা বিভিন্ন স্বাস্থ্য বিমা কোম্পানি এবং টিপিএ-র (যেমন — বাজাজ অ্যানিয়ান্স, ইফকো টোকিও ইত্যাদি বৃহৎ কর্পোরেট বিমা কোম্পানি) সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রে চিকিৎসার খরচ এরাই বহন করবে। কিন্তু প্রিমিয়ামের মোটা অঙ্কের টাকা সরকারই মেটাবে।

সরকার কোত্থেকে মেটাবে? না, মানুষের ট্যাক্সের টাকা থেকেই মেটাবে। কিন্তু আশঙ্কাটা অন্য জায়গায়। এখন বিমার প্রিমিয়াম হিসাবে টাকা দিতে না হলেও, ভবিষ্যতে সাধারণ মানুষের উপর প্রিমিয়ামের টাকা যে ধার্য করা হবে না, তার কিন্তু কোনও গ্যারান্টি নেই। এখনও পর্যন্ত এই পাঁচ লক্ষ টাকার মধ্যে ১.৫ লক্ষ টাকা সরকার বিমার প্রিমিয়াম হিসাবে বিমা কোম্পানিকে দিয়ে থাকে এবং বাকি ৩.৫ লক্ষ টাকা অ্যাসুয়েরেন্স হিসাবে থার্ড পার্টি মারফত সরকারি-বেসরকারি হাসপাতাল, নার্সিংহোমগুলিতে চিকিৎসার বিল মেটায়।

এতদিন সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা কেমন ছিল? স্বাধীনতার পর আমাদের দেশে জাতীয় স্বাস্থ্যব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। ভারতের মতো জনকল্যাণমূলক একটি রাষ্ট্রে স্বাস্থ্যকে মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া না হলেও তা অবশ্যপ্রয়োজনীয় বিষয় হিসাবেই রয়েছে এবং সংবিধান মানুষের বাঁচার অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে। ফলে ৯০-এর দশকের আগে পর্যন্ত দেশের বহু জায়গায় এবং আমাদের রাজ্যেও সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা ছিল একেবারেই ফ্রি। সেখানে কোনও রকম চার্জ বা কোনও রকম কার্ডের কোনও ব্যাপারই ছিল না।

৯০-এর দশকের শুরুতে এ রাজ্যে সিপিএম সরকার সরকারি হাসপাতালে আউট ডোর টিকিটের দাম ধার্য করে এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার চার্জ, বেড ভাড়া ইত্যাদি চালু করা হয়। পশ্চিমবঙ্গেই প্রথম তদানীন্তন সিপিএম সরকারের হাত ধরে সরকারি হাসপাতালে সিটি স্ক্যান, এক্স রে, রক্ত পরীক্ষা ইত্যাদি পরিষেবাগুলিতে পিপিপি নীতির অনুপ্রবেশ ঘটে। অর্থাৎ সরকারি হাসপাতালে বেসরকারি সংস্থাগুলিকে পরিষেবা বিক্রির অধিকার দেওয়া হয়। টাকার বিনিময়ে মানুষকে সেখান থেকে পরিষেবা নিতে বাধ্য করা হয়। সে দিনও মানুষকে স্বপ্ন দেখানো হয়েছিল— সিটি স্ক্যানের মতো অত্যাধুনিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ তো আগে মানুষ পেত না, বর্তমানে তা হাতের কাছেই সুলভে পাচ্ছে! কিন্তু যে কথাটা সেদিন ওরা গোপন করেছে তা হল, চিকিৎসার প্রয়োজনে যা যা দরকার তার সবটাই পূরণ করা সরকারেরই দায়িত্ব। তা ছাড়া পিপিপি মোডে ওই সব পরিষেবা চালাতে যে পরিমাণ টাকা সরকারকে খরচ করতে হয়েছে তা দিয়ে চাইলে সরকার ওই সব পরিষেবা অনায়াসেই সরকারি ভাবেই সরাসরি চালু করতে পারতো। যেখান থেকে মানুষ বিনা পয়সাতেই পরিষেবা পেতে পারতো। কিন্তু সিপিএম সরকার সে পথে গেল না। কারণ, ওদের লক্ষ্য ছিল স্বাস্থ্যব্যবসায়ীদের মুনাফার সুযোগ করে দেওয়া। এর বিরুদ্ধে এস ইউ সি আই (সি) ও তার বিভিন্ন সংগঠনগুলি হাসপাতালে বিনামূল্যে চিকিৎসার দাবিতে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলে। এবং এই দাবিটা রাজ্যে পালাবদলের সময় জনতার দাবি হিসাবে এসে যায়।

ফলে তৃণমূল সরকার অনেক বিলম্বে হলেও ২০১৫ সালে ঘোষণা করতে বাধ্য হয়— সরকারি হাসপাতালের সমস্ত পরিষেবাই হবে ফ্রি। বহু ক্ষেত্রে নিম্নমানের এবং অপ্রতুল হলেও মানুষ সরকারি হাসপাতাল থেকে বিনা পয়সায় পরিষেবা আবার পেতে শুরু করে। কিন্তু এক বছরের মধ্যেই এই বিনা মূল্যের চিকিৎসা ব্যবস্থা থেকে ধীরে ধীরে সরে যেতে শুরু করে তৃণমূল সরকার।

এটা ত্বরান্বিত করতেই ২০২০ সালের ডিসেম্বর মাসে সরকার সকলের জন্য স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের কথা ঘোষণা করে। বর্তমানে স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের মাধ্যমে কেমন চলছে এই চিকিৎসা? সংবাদপত্রে প্রায়ই দেখা যাচ্ছে, বেশিরভাগ বেসরকারি হাসপাতাল স্বাস্থ্যসাথী কার্ড দেখলেই বলছে, কোনও বেড ফাঁকা নেই! ভোটের আগে যারা স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের বিনিময়ে ভর্তি হতে পেরেছিলেন তাঁদের অভিযোগ কী? ক'দিনে পাঁচ লাখ টাকা শেষ হয়েছে? মুহূর্তের মধ্যেই লক্ষ লক্ষ টাকার বিল তৈরি হয়েছে, তার কতটা থার্ড পার্টি বা বিমা মেটানোর চাপে, কতকটা আবার কর্পোরেট হাসপাতালের নিজস্ব উদ্যোগে।

আর টাকা শেষ হয়ে গেলে চিকিৎসাও যাবে থেমে। এখন দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন বেসরকারি হাসপাতাল, নার্সিংহোম তাদের বিপুল অঙ্কের বকেয়া বিল না পেয়ে কোর্টের দ্বারস্থ হচ্ছে এবং নতুন করে স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের বিনিময়ে রোগী ভর্তির প্রক্রিয়া তারা প্রায় বন্ধই করে দিচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীকে এ নিয়ে হুঙ্কারও ছাড়তে হয়েছে।

স্বাস্থ্যসাথী নির্ভর চিকিৎসা পরিষেবার মাধ্যমে কি মানুষের বিনামূল্যে চিকিৎসা পাওয়ার দিন শেষ? আপাত অর্থে মানুষকে সরাসরি অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে না। সেই অর্থে কেউ ভাবতে পারে— বিমা কার্ড চালু হলে তার ক্ষতি কী? কিন্তু প্রশ্ন হল, এই পরিষেবার বিনিময়ে সরকারকে যে মোটা অঙ্কের সাদা এবং কালো বিল মেটাতে হবে, সে টাকা কে দেয়? তা তো সাধারণ মানুষের ট্যাক্সের টাকাই। আর ট্যাক্স তো প্রতিটা মানুষই দেয় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে। পূর্বেও সরকার যখন সরাসরি স্বাস্থ্য পরিষেবা দিত তখনও জনগণের ট্যাক্সের টাকাতেই তো চলতো। এখন স্বাস্থ্যসাথী নামক বিমা কার্ডের মাধ্যমে চিকিৎসা হলে কিছু বাড়তি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হবে। কারণ বিমাকার্ড মানেই নানা শর্ত তাতে জোড়া থাকবে। কোনটা ওই সব শর্তে লেখা আছে, আর কোনটা নেই— তা দেখেই তো চিকিৎসা হবে। ফলে চিকিৎসা শুরু হতে যেমন বিলম্ব হবে, তেমনই নানা জটিলতার ফাঁদে চিকিৎসা বহু ক্ষেত্রে শেষও হবে না। আর বিমা নির্ভর চিকিৎসা যেহেতু নানা কোম্পানি ও থার্ড পার্টির মুনাফার লক্ষ্যেই পরিচালিত হয়, সেহেতু মুনাফা বাড়াতে নানা অসাধু শর্ত পূরণ করতে চিকিৎসার খরচও বহুগুণ বাড়বে। আর এই বর্ধিত খরচ মানুষকেই মেটাতে হবে।

বিমার টাকা এখন সরকার দিলেও পরবর্তীতে বিমার এই প্রিমিয়াম মানুষকে আলাদা করে বহন করতে হবে না, সে গ্যারান্টিই বা কোথায়? সরকারি হাসপাতালে আজ যেখানে সম্পূর্ণ চিকিৎসাই ফ্রি, সেখানে সমস্ত রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা, ওষুধ-পথ্য, বেড ভাড়া, সার্ভিস চার্জ, অপারেশন চার্জ ইত্যাদি সব মিলিয়ে তৈরি হবে প্যাকেজ। যার দায়ভার জনগণকেই মেটাতে হবে। নতুন করে হেলথ ট্যাক্সও চালু হতে পারে, যার কথা তৃতীয় স্বাস্থ্য নীতিতে উল্লেখ রয়েছে। ফলে বিনা পয়সায় চিকিৎসার দিন সত্যি-সত্যিই আজ শেষ হতে চলেছে। একই সাথে সরকার ও বিমা কোম্পানির অসাধু আঁতাতের ফলে ধ্বংস হতে চলেছে মেডিকেল এথিক্সও।

প্রশ্ন উঠছে — স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের শর্ত অনুসারে ৫ লক্ষ টাকা শেষ হয়ে গেলে ওই ব্যক্তির বা তার পরিবারের বাকি চিকিৎসার কী হবে? শর্ত অনুযায়ী বলা যায়, তার দায় সরকার আর নেবে না। বর্তমান অর্থমূল্যের বাজারে ৫ লক্ষ টাকার চিকিৎসা আর কতটুকু? যেখানে আসল বিলের সাথে বহুগুণে যোগ হয়ে তৈরি হয়ে যায় অসাধু বিল! পূর্বে যেখানে মানুষ সম্পূর্ণ চিকিৎসাই বিনামূল্যে পেতো এবং সেটাই ছিল তার অধিকার, এখন স্বাস্থ্যসাথী এসে সেটাকেই হটিয়ে দিল।

প্রশ্ন উঠছে— যাদের কার্ড নেই তাদের চিকিৎসা কি সরকারি হাসপাতালে হবে না? সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী তো তাই দাঁড়ায়। কার্ড না থাকলে এখন থেকে আর সরকারি হাসপাতালে ভর্তি হওয়া যাবে না, অর্থাৎ ইনডোর চিকিৎসা মিলবে না। যদিও বলা হচ্ছে— যার কার্ড নেই, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তার কার্ড তৈরি করে দেবে। কিন্তু যারা স্বাস্থ্যসাথী কার্ড হাতে পেয়েছেন, বহু ক্ষেত্রেই তাদের হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে।

প্রশ্ন আরও — অন্য রাজ্যের মানুষ কি আর এ রাজ্যের সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা পাবে না? নির্দেশিকা অনুযায়ী তো তাই দাঁড়ায়। কার্ড না থাকলে চিকিৎসা মিলবে না। এই স্বাস্থ্যসাথী কার্ড তো কেবল পশ্চিমবঙ্গবাসীরই জন্য। ফলে মেডিকেল এথিক্স যেখানে বলছে— চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে কোনও সীমারেখা থাকে না। মানুষের ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক অবস্থান, ধর্ম, বর্ণ, জাত-পাত কোনও কিছুই দেখা চলে না। স্বাস্থ্যসাথী কার্ড বাধ্যতামূলক হলে, কী নিদারুণভাবে লঙ্ঘিত হবে মেডিকেল এথিক্স!

অনেকেই বলছেন, বিমা কোম্পানি এবং থার্ড পার্টিকে যে টাকা সরকার দিচ্ছে, সেই পরিমাণ অর্থ সরাসরি স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় করলে কি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার আরও বেশি উন্নয়ন করা যেতো না? প্রশ্নটা তো সেখানেই। সরকার কখনওই স্বাস্থ্য বাজেটে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করে না। ভোর কমিটি স্বাধীনতার পূর্বেই সুপারিশ করেছে, স্বাস্থ্য খাতে কমপক্ষে জিডিপি-র ১০ শতাংশ বরাদ্দ করতে হবে। আজ পর্যন্ত কেন্দ্র-রাজ্য কোনও সরকারই তা বরাদ্দ করেনি। সেই বাজেট ১.৮ শতাংশের নীচেই ঘোরাফেরা করছে। বিমা নির্ভর স্বাস্থ্যব্যবস্থা চালু হলে তার একটা বড় অংশই বিমা কোম্পানি ও থার্ড পার্টির দেয় মেটাতেই চলে যাবে। ফলে পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং বিভিন্ন কর্মসূচিতে আজ সে অর্থ খরচ হয় সেখানেও টান পড়বে। আজও যতটুকু স্বাস্থ্য পরিকাঠামো রয়েছে তাও মুখ থুবড়ে পড়বে।

জীবনাবসান

এস ইউ সি আই (সি)-র কলকাতা জেলা কমিটির প্রাক্তন সদস্য কমরেড সুমিত্রা মৈত্র দীর্ঘ রোগভোগের পর ক্যালকাটা হার্ট ক্লিনিক অ্যান্ড হসপিটালে ১০ নভেম্বর শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর।

কমরেড সুমিত্রা মৈত্র সংস্কৃত কলেজে পড়ার সময় কমরেড শিবদাস ঘোষের বৈপ্লবিক চিন্তাধারার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ছাত্র সংগঠন এআইডিএসও-র কাজের সঙ্গে যুক্ত হন। সংস্কৃতে স্নাতক হওয়া সত্ত্বেও তিনি সংগঠনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্নাতক ডিগ্রি সারেন্ডার করে দক্ষিণ কলকাতার মুরলীধর গার্লস কলেজে পুনরায় প্রথম বর্ষে ভর্তি হন এবং ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদিকা নির্বাচিত হন।

পরবর্তীকালে কলকাতা পুরসভার ৭২নং ওয়ার্ডে (বর্তমান ৬৯ নং ওয়ার্ড) কমরেড পূর্ণিমা দাশগুপ্ত দলের কাউন্সিলর নির্বাচিত হওয়ার পর কমরেড মৈত্র ওই ওয়ার্ড সহ সংলগ্ন এলাকায় দলের সংগঠন গড়ে তোলার দায়িত্ব পান এবং ইউনিট ইনচার্জ হিসাবে কাজ শুরু করেন। সিপিএম সরকারের ইংরেজি ও পাশফেল প্রথা তুলে দেওয়ার বিরুদ্ধে দলের আহ্বানে গড়ে ওঠা ভাষা-শিক্ষা আন্দোলন সহ বহু আন্দোলনে এলাকায় নেতৃত্বকারী ভূমিকা পালন করেন। শরৎ জন্ম-শতবার্ষিকী সহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও সামাজিক কার্যক্রমে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন।

পরে মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের রাজ্য কমিটির সদস্য হিসাবে বিভিন্ন জেলার সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন করেন। শেষ বয়সে শারীরিক ভাবে অসুস্থ অবস্থায় দেশপ্রিয় পার্ক এলাকায় নিজ বাসভবনকে কেন্দ্র করে স্থানীয় বিশিষ্ট মানুষদের যুক্ত করার মধ্য দিয়ে রোকেয়া সাংস্কৃতিক পাঠচক্র গড়ে তোলেন ও নবদিগন্ত নামে একটি বাৎসরিক পত্রিকা প্রকাশ করেন।

ক্যালকাটা হার্টক্লিনিকে তাঁর মরদেহে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড ছায়া মুখার্জী ও কমরেড সুভাষ দাশগুপ্ত। এছাড়াও দলের জেলা কমিটির সদস্য কমরেড ভারতী মৈত্র ও অন্যান্য কমরেডরাও মাল্যদান করেন। হাসপাতাল থেকে তাঁর বাসভবন হয়ে চেতলা লোকাল পার্টি অফিসে তাঁর মরদেহ নিয়ে আসা হলে সেখানে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও কলকাতা জেলা সম্পাদক কমরেড সুব্রত গৌড়ী, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড নভেন্দু পাল ও অন্যান্য নেতা ও কর্মীরা।

কমরেড সুমিত্রা মৈত্র লাল সেলাম

সোভিয়েত শক্তি

জে ভি স্ট্যালিন

রুশ নভেম্বর বিপ্লবের ১০৪তম বার্ষিকী উপলক্ষে এবার মহান স্ট্যালিনের একটি রচনা প্রকাশ করা হল। রচনাটি ১৯১৭ সালের ১৩ অক্টোবর প্রকাশিত হয়েছিল 'রাবোচি পুত'-পত্রিকার ৩৫তম সংখ্যায়। সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত রাশিয়ায় 'সোভিয়েত'-এর হাতে ক্ষমতার অর্থ বাস্তবে কী— এই রচনাটি তা বুঝতে সাহায্য করবে।

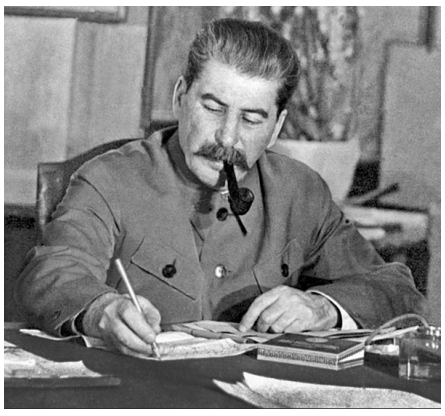

বিপ্লবের প্রথম দিকের দিনগুলোয় 'সব ক্ষমতা চাই সোভিয়েতের হাতে'— স্লোগানটা ছিল একটা অভিনব কথা। এই প্রথম 'সোভিয়েত শক্তির' প্রতিষ্ঠা হল এপ্রিলে, অস্থায়ী সরকারের ক্ষমতার বিরুদ্ধে। রাজধানীর অধিকাংশই তখনও ছিল অস্থায়ী সরকারের পক্ষে। এই অস্থায়ী সরকারে রাজধানীর অধিকাংশই মিলিউকভ আর গুচকভকে চাইছিলেন না। জুনে শ্রমিক এবং সৈন্যদের অধিকাংশ বিক্ষোভ সমাবেশ থেকেই উঠতে লাগল এই স্লোগান। রাজধানীতে অস্থায়ী সরকার ততদিনে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। জুলাইতে 'সব ক্ষমতা চাই সোভিয়েতের হাতে'— স্লোগানটা নিয়েই রাজধানীতে সংখ্যাগুরু বিপ্লবী আর লভভ-কেরেনস্কি সরকারের মধ্যে জ্বলে উঠল সংগ্রামের আগুন। আপসকামী সেন্ট্রাল এক্সিকিউটিভ কমিটি প্রদেশের পশ্চাৎপদতার উপর নির্ভর করে চলে গেল সরকারের দিকে। সংগ্রামে জয় হল সরকার পক্ষের। কোণঠাসা হয়ে পড়ল সোভিয়েত শক্তির অনুগামীরা। তারপর শুরু হল এক শ্বাসরোধকারী অবস্থা। চলল 'সমাজতন্ত্রী'দের দমন আর 'রিপাবলিকান'দের জেলে ঢোকানো। চলল কুটিল সব ষড়যন্ত্র আর সামরিক ছক কষা। যুদ্ধক্ষেত্রে রইল ফায়ারিং স্কোয়াড আর পিছনে 'সম্মেলন'। আগস্টের শেষ পর্যন্ত চলল এই অবস্থা। পরিস্থিতি আমূল বদলে গেল আগস্টের শেষ দিকে। কর্নিলভের অভ্যুত্থান প্রতিরোধে প্রয়োজন হয়ে পড়ল বিপ্লবী শক্তির শেষ বিন্দুটারও।

পিছনে সোভিয়েতগুলো আর সীমান্তে কমিটিগুলো একরকম নিষ্ক্রিয় হয়েই পড়েছিল জুলাই আর আগস্টে। 'হঠাৎ' যেন নতুন প্রাণ সঞ্চার হল তাদের মধ্যে। তারা ক্ষমতা দখল করে নিল সাইবেরিয়া আর ককেশাসে, ফিনল্যান্ড আর উরালে, ওডেসা আর খারকভে। যদি তা না করা হত, ক্ষমতা যদি দখল না করা হত, বিপ্লব ধ্বংস হয়ে যেতে পারত। এইভাবে, এপ্রিলে পেট্রোগ্রাড শহরের 'ছোটো একদল' বলশেভিক যে 'সোভিয়েত শক্তি'র ঘোষণা করেছিল, আগস্টের শেষ নাগাদ তা স্বীকৃতি পেল প্রায় সমগ্র রাশিয়ার বিপ্লবী শ্রেণির।

সবার কাছেই এখন পরিষ্কার যে 'সোভিয়েত শক্তি' কেবল একটা জনপ্রিয় স্লোগান নয়, বিপ্লবের বিজয়ের জন্য প্রয়োজনীয় একমাত্র অমোঘ হাতিয়ার, বর্তমান পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার একমাত্র রাস্তা।

অবশেষে সময় এসেছে 'সব ক্ষমতা চাই সোভিয়েতের হাতে' স্লোগানটাকে হাতে কলমে করে দেখাবার।

কিন্তু 'সোভিয়েত শক্তি' কী? অন্য শক্তিগুলোর সাথে তার তফাৎ কোথায়?

বলা হয় সোভিয়েতের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের অর্থ হল একটা 'সম প্রকৃতি'র গণতান্ত্রিক সরকার গঠন করা, 'সমাজতন্ত্রী' মন্ত্রীদের নিয়ে একটা নতুন 'মন্ত্রীসভা' গঠন করা এবং মোটের উপর অস্থায়ী সরকারের গঠনের একটা 'গুরুত্বপূর্ণ' পরিবর্তন ঘটানো। কিন্তু এটা সত্য নয়। এটা আদৌ অস্থায়ী সরকারের কয়েকজন সদস্যের বদলে অন্য কয়েকজনকে নিয়ে আসার বিষয় নয়। যেটা বিষয়, তা হল, নতুন বিপ্লবী শ্রেণিগুলিকে দেশের কর্তৃত্বে নিয়ে আসা। আসল কথা হল সর্বহারা এবং বিপ্লবী চাষিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা। কিন্তু এ জন্য সরকারের কিছু মামুলি পরিবর্তনই যথেষ্ট নয়। সবার আগে যা দরকার তা হল সরকারের সমস্ত দপ্তর আর প্রতিষ্ঠানগুলোর আগাগোড়া শুদ্ধিকরণ। দরকার এর সব কটি থেকে কর্নিলভপন্থীদের বরখাস্ত করে সর্বত্র মজুর চাষির প্রতি বিশ্বস্ত লোকদের নিয়োগ করা। তখনই এবং কেবল তখনই বলা যাবে 'কেন্দ্রে এবং স্থানীয়ভাবে' সোভিয়েতের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা গেছে।

সর্বহারা এবং কৃষকের একনায়কত্বের অর্থ এমন একনায়কত্ব যা জনগণকে দমন করে না, যা চলে জনগণের ইচ্ছায়, যা জনগণের শত্রুর আশা-আকাঙ্ক্ষার সমাধি রচনা করে।

অস্থায়ী সরকারের 'সমাজতন্ত্রী' মন্ত্রীদের এই চরম অসহায় অবস্থার কারণ কী? এই মন্ত্রীরা যে অন্তর্বর্তী সরকারের বাইরের কিছু লোকের হাতের তুচ্ছ পুতুলে পরিণত হয়েছেন, তার কারণ কী? ('ডেমোক্রেটিক কনফারেন্সে' চেরনভ এবং স্কোবেলেভ, জারুদ্‌নি এবং পেশেখোনভের 'রিপোর্ট'-এর কথা মনে করুন)। কারণ হল, প্রথমত এই মানুষগুলো দপ্তর পরিচালনা করছেন— এমন হওয়ার বদলে এদের দপ্তরই এদের পরিচালনা করেছে। অন্যান্য কারণের মধ্যে একটা হল, প্রত্যেকটা দপ্তরই এক একটা দুর্গ, যেখানে জার আমলের আমলারা ঘাঁটি গেড়ে রয়েছে। মন্ত্রীদের মহান ইচ্ছেগুলোকে এরা পরিণত করে ফাঁকা 'বুলিতে' এবং কর্তৃপক্ষের প্রতিটা বিপ্লবী পদক্ষেপে অন্তর্ঘাত করতে এরা তৈরি। সোভিয়েতের হাতে ক্ষমতা দেওয়ার কাজটা যদি কথার কথা না হয়, যদি তা সত্যিই করতে হয়, তা হলে ওই দুর্গগুলো দখল করতেই হবে। কাদেত-জার জমানার দালালদের দূর করতে হবে ওখান থেকে। সেই জায়গায় বসাতে হবে বিপ্লবের প্রতি বিশ্বস্ত এবং নির্বাচিত কর্মীদের, প্রয়োজনে যাদের ফিরিয়ে আনা যায়।

সোভিয়েতের হাতে ক্ষমতার অর্থ হল, পশ্চাৎভাগ ও রণাঙ্গণের সমস্ত সরকারি প্রতিষ্ঠানকে আগাগোড়া শুদ্ধিকরণ করা।

সোভিয়েতের হাতে ক্ষমতার অর্থ পশ্চাদভাগ ও রণাঙ্গণের সমস্ত 'কর্তৃপক্ষ'কে নির্বাচিত হতেই হবে এবং প্রয়োজনে তাদের ফিরিয়ে আনার ক্ষমতাও জনগণের থাকবে। সোভিয়েতের হাতে ক্ষমতার অর্থ গ্রাম-শহরে, সেনাবাহিনী এবং নৌবাহিনীতে, 'দপ্তর' এবং 'প্রতিষ্ঠানে', 'রেলে', 'ডাক এবং টেলিগ্রাফ' অফিসে 'কর্তৃত্বের আসনে থাকা প্রত্যেক ব্যক্তি'কে নির্বাচিত হতেই হবে এবং প্রয়োজনে তাদের ফিরিয়েও আনা যাবে।

সোভিয়েতের হাতে ক্ষমতার অর্থ সর্বহারা এবং বিপ্লবী কৃষকের একনায়কত্ব।

অতি সম্প্রতি কেরেনস্কি আর তেরেশ্চেঙ্কোর বদান্যতায় কর্নিলভ এবং মিলিউকভ যে একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে তার থেকে, বুর্জোয়া সাম্রাজ্যবাদী একনায়কত্বের থেকে তা গুণগতভাবেই পৃথক।

সর্বহারা এবং বিপ্লবী কৃষকের একনায়কত্ব হল মানুষের জন্য রুটির স্বার্থে, চাষির জন্য জমির স্বার্থে, উৎপাদন এবং বন্টনের উপর শ্রমিকের নিয়ন্ত্রণের স্বার্থে, গণতান্ত্রিক শান্তির স্বার্থে, সংখ্যালঘু শোষকের উপর, ভূস্বামী এবং পুঁজিপতিদের উপর, ব্যাঙ্ক-মালিক এবং মুনাফাখোরদের উপর খেটে-খাওয়া সংখ্যাগুরু জনতার একনায়কত্ব।

বিপ্লবী কৃষক এবং সর্বহারার একনায়কত্বের অর্থ জনতার প্রকাশ্য একনায়কত্ব। তাতে না থাকে কোনও ষড়যন্ত্র, না থাকে টেবিলের তলায় কোনও লেনদেন, যা ঘটে তা সকলের চোখের সামনেই ঘটে। পুঁজিপতিরা লক-আউট করে, নানাভাবে নিজেদের 'দায় খালাস' করে, বেকারত্ব বৃদ্ধি করে। মুনাফাখোর ব্যাঙ্কাররা খাবারের দাম বাড়ায়, মানুষকে বাধ্য করে উপোস করতে। এদের যে দয়া করা হবে না, এ সত্য গোপন করার কোনও কারণ নেই এই একনায়কত্বের।

সর্বহারা এবং কৃষকের একনায়কত্বের অর্থ এমন একনায়কত্ব যা জনগণকে দমন করে না, যা চলে জনগণের ইচ্ছায়, যা জনগণের শত্রুর আশা-আকাঙ্ক্ষার সমাধি রচনা করে।

'সব ক্ষমতা চাই সোভিয়েতের হাতে'— এই হল শ্রেণি মর্মবস্তু।

আভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক কর্মকাণ্ডের বিকাশ, দীর্ঘকাল ধরে চলতে থাকা যুদ্ধের ফলে শান্তির জন্য আকুতি, ফ্রন্টে পরাজয় আর রাজধানী রক্ষার প্রয়োজন, অন্তর্বর্তী সরকারের পচাগলা অবস্থা, আর মস্কোতে তার ঘোষিত 'অপসারণ', অর্থনীতির বিধ্বস্ত অবস্থা আর ক্ষুধা, বেকারত্ব আর জনগণের দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া— এ সবই রাশিয়ার বিপ্লবী শ্রেণিগুলোকে অপ্রতিরোধ্য ভাবে উদ্বুদ্ধ করছে ক্ষমতা দখল করতে। অর্থাৎ সর্বহারা এবং বিপ্লবী কৃষকের একনায়কত্বের জন্য দেশ ইতিমধ্যেই পরিপক্ক হয়ে উঠেছে।

অবশেষে সময় এসেছে 'সব ক্ষমতা চাই সোভিয়েতের হাতে'— এই স্লোগানকে বাস্তবায়িত করার।

জামশেদপুরে ছাত্র সম্মেলন

১৫ নভম্বর বীর শহিদ বিরসা মুণ্ডার জন্মদিনে মানগো গুরুদ্বারা হলে এআইডিএসও-র জামশেদপুর শহর কমিটির

দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে প্রায় দুই শতাধিক ছাত্র উপস্থিত ছিল। সংগঠনের নেতৃবৃন্দ নীতিনৈতিকতার সংকট, আর্দশহীনতা ও সমাজবিমুখতার বিপরীতে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে উন্নত চরিত্র গড়ে তুলতে ভগৎ সিং, বিরসা মুণ্ডা সহ অন্যান্য মনীষীদের জীবনসংগ্রাম চর্চার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। সম্মেলন থেকে শুভম ঝাকে সভাপতি, সবিতা সোরেনকে সম্পাদক ও ঝর্না মাহাতকে কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত করে নতুন জামশেদপুর শহর কমিটি গঠিত হয়।

নভেম্বর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ১০৪তম বার্ষিকী উপলক্ষে শিলিগুড়ি বাঘাযতীন পার্কে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পদযাত্রা। ১৬ নভেম্বর

গণআন্দোলনই পারে

একের পাতার পর

কৃষকজীবনের দীর্ঘ দিনের সমস্যা। কৃষকদের অন্যতম দাবি ছিল ফসলের ন্যূনতম সরকারি সহায়ক মূল্য ঘোষণা এবং চরম কৃষকস্বার্থবিরোধী তথা জনস্বার্থ বিরোধী বিদ্যুৎ আইন প্রত্যাহারও। যেখানেই কৃষকরা প্রতিবাদে সমবেত হয়েছেন, বিক্ষোভ দেখিয়েছেন সেখানেই পুলিশ তাঁদের নামে মিথ্যা মামলা চাপিয়েছে। সেগুলি প্রত্যাহারের কোনও কথা প্রধানমন্ত্রী বলেননি। এমনকি ঘোষণার সময়ে প্রধানমন্ত্রী মৃত কৃষকদের প্রতি কোনও রকম শ্রদ্ধা জানাননি। তিনি এখনও বলছেন, এই আইনে নাকি কৃষকদের স্বার্থই রক্ষা হত। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী এবং তার সরকার নাকি সে-কথা কৃষকদের বোঝাতে পারেননি। অর্থাৎ ঘোষণার মধ্যে কোথাও সরকারের ভুল স্বীকার নেই। বরং কৃষকদের ভুলের কথাই তিনি বলেছেন। এ থেকেই স্পষ্ট সরকার কোনও নীতিগত কারণে এই আইন প্রত্যাহার করছে না। নিছক চাপে পড়েই করছে। অর্থাৎ সুযোগ পেলেই তাঁরা আবার এই আইন নিয়ে আসবেন।

ভুল যদি সরকার না-ই করে থাকে তবে আইন পাশের এক বছর পরে কেন তা প্রত্যাহার? কেন প্রধানমন্ত্রীর এমন ক্ষমা প্রার্থনা? গুজরাতে মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন গোধরা গণহত্যার পরে তিনি ক্ষমা চাননি। রাতারাতি নোটবাতিলে কয়েকশো মানুষের মৃত্যু এবং সাধারণ মানুষের জীবনে চরম দুর্গতি দেখেও তিনি ক্ষমা চাননি। প্রথমে এনআরসি এবং পরে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে প্রবল জনমতের সামনেও তিনি ক্ষমা চাননি। রাফালে ভয়ঙ্কর দুর্নীতি কিংবা বেআইনি পেগাসাস কাণ্ডের পরেও তিনি ক্ষমা চাননি। তা হলে এ বার এমন বোধোদয়ের কারণ কী? আসলে বোধোদয়টা কৃষি আইনের ভাল-মন্দ নিয়ে নয়। একদিকে একচেটিয়া পুঁজি মালিকদের সেবাদাস এই পুঁজিবাদী রাষ্ট্রকাঠামোটার আসল চরিত্রটা কৃষকদের চোখে যেভাবে বেআব্রু হয়ে ধরা দিচ্ছে, তা কর্পোরেট প্রভুদের ভাবিয়েছে। ফলে তারা পিছনের দরজা খুঁজতে ব্যগ্র হয়ে উঠেছেন। অন্যদিকে এই প্রভুদের সেবা করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী তথা তাঁর দলের সঙ্কট বুঝেই এই বোধোদয়।

রক্তাক্ত হয়েও আন্দোলনে অটল

একচেটিয়া পুঁজির পূর্ণ মদতে ক্ষমতায় বসা বিজেপি সরকার পুঁজিপতি শ্রেণির মুনাফার জন্য গোটা কৃষিক্ষেত্রটাকে খুলে দিতে চেয়েছিল। তারা ভেবেছিল, আইনের বিরুদ্ধে কৃষকদের প্রতিবাদকে তারা পুলিশ দিয়ে, বিচার ব্যবস্থার একাংশকে কাজে লাগিয়ে, একচেটিয়া পুঁজির মালিকানাধীন সংবাদমাধ্যমের সাহায্যে ক্রমাগত মিথ্যা ও কুৎসা প্রচার করে স্তব্ধ করে দিতে পারবে। যেখানেই কৃষকরা প্রতিবাদে সামিল হয়েছেন পুলিশ নির্বিচারে তাঁদের নামে মিথ্যা মামলা করেছে, লাঠিপেটা করেছে, জলকামান ব্যবহার করেছে। কৃষকরা যাতে রাজধানীর দিকে এগোতে না পারেন তার জন্য তাঁদের অবস্থানের জায়গার চারদিকে কংক্রিটের ব্যারিকেড তৈরি করে তাতে লোহার ফলা পুঁতে দিয়েছে। তাঁদের জল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, বিদ্যুতের লাইন কেটে দেওয়া হয়েছে। বিজেপি নেতারা লাগাতার আন্দোলনকারীদের দেশদ্রোহী, খালিস্তানি, সন্ত্রাসবাদী বলেছেন, এমনকি আন্দোলনকে পাকিস্তান মদতপুষ্ট বলতেও ছাড়েননি। প্রধানমন্ত্রী নিজে আন্দোলনের নেতাদের বলেছেন, এঁরা কৃষিজীবী নন, আন্দোলনজীবী। সব ব্যঙ্গ বিদ্রূপ কুৎসা কৃষকরা নীরবে সহ্য করেছেন। নিজেদের দাবিতে অনড় থেকেছেন। আর যত দিন গেছে ততই সরকারের মন্ত্রীরা, বিজেপির নেতারা দেখেছেন, আন্দোলন স্তব্ধ হওয়া দূরের কথা, দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়েছে এক রাজ্য থেকে আর এক রাজ্যে, এক গ্রাম থেকে আর এক গ্রামে। আন্দোলনের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন ছাত্র যুব মহিলা শ্রমিক চিকিৎসক বুদ্ধিজীবী সহ সমাজের প্রায় সব অংশের মানুষ। যতই এমনটা ঘটেছে ততই বিজেপির পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেছে। একের পর এক নির্বাচনে ধরাশায়ী হয়েছে বিজেপি। সামনে পাঁচটি রাজ্যের নির্বাচন। কয়েক মাস আগে উত্তরপ্রদেশের পঞ্চায়েত নির্বাচনে গ্রামসভাগুলিতে গোহারা হয়েছে বিজেপি। এবার বিধানসভা নির্বাচনে হারলে ২০২৪-এর লোকসভাও থেকে যাবে অধরা। তাই এই ক্ষমা প্রার্থনার নাটক।

প্রধানমন্ত্রী তথা বিজেপির এই চাল ধরতে পারবে না, এতখানি বেকুব কৃষকরা এবং তাঁদের নেতারা নন। স্বাভাবিক ভাবেই কৃষকরা আন্দোলনে অনড় রয়েছেন। ঘোষণা করেছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না সংসদে আইন পুরোপুরি ফিরিয়ে নেওয়া না হচ্ছে, যতক্ষণ পর্যন্ত অন্য দাবিগুলিও মেনে নেওয়া না হচ্ছে ততক্ষণ তাঁদের আন্দোলন চলবে। লাগাতার আন্দোলনের যে কর্মসূচি তাঁদের রয়েছে তার কোনও নড়চড় হবে না।

এই আন্দোলন থেকে যা শিক্ষণীয় তা হল, গত এক বছর ধরে একটা স্বৈরাচারী ফ্যাসিস্ট সরকারের সব রকমের হুমকি, অত্যাচার সত্ত্বেও কৃষকরা তাঁদের দাবিতে, আন্দোলনে অনড় থেকেছেন। যেখানে প্রায়ই দেখা যায় শ্রমিক কৃষক কিংবা সাধারণ মানুষের জীবিকার নানা ক্ষেত্রে গড়ে ওঠা আন্দোলনগুলিতে নেতৃত্বের লজ্জাজনক আপস, মালিকের পায়ে কিংবা সরকারের কাছে জনস্বার্থ বিসর্জন দিয়ে নিজেদের আখের গুছিয়ে নেওয়া, নিজেদের এমএলএ এমপি মন্ত্রী হওয়ার রাস্তাকে মসৃণ করে নেওয়া সেখানে কৃষক নেতারা এ সবের থেকে নিজেদের দৃষ্টান্তমূলক ভাবে রক্ষা করেছেন। কিন্তু কী ভাবে তাঁরা এটা করতে পারলেন?

আসলে কৃষি আইনে কৃষকরা তাঁদের সর্বনাশকে গভীর ভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁরা বুঝেছিলেন, এই আইন চালু হলে তাঁরা সর্বস্বান্ত হবেন। তাঁরা যে কোনও মূল্যে এই আইনকে রুখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দেশের ভোটসর্বস্ব রাজনৈতিক দলগুলির এবং তার নেতাদের চরিত্র তাঁদের চেনা। দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকেই তাঁরা বুঝেছিলেন, এই নেতারা কখনওই তাদের জন্য সত্যিকারের লড়াই করবেন না। বরং অন্য সব লড়াইয়ের মতো এ ক্ষেত্রেও তাঁরা কৃষকদের সংগ্রাম, আত্মত্যাগকে পুঁজি করে নির্বাচনী ফয়দা তুলবেন। শুরু থেকেই এই সব ধুরন্ধর, ক্ষমতালোভী, নীতিহীন নেতাদের আন্দোলনের মঞ্চ ব্যবহারে কঠোর নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা করেছিলেন আন্দোলনরত কৃষকরা। তাই কৃষকদের মঞ্চ থেকে কোনও 'নামকরা' নেতার গরম গরম বক্তৃতা শোনা যায়নি। এমনকি সরকারি নেতা-মন্ত্রীরাও যাতে নেতাদের প্রভাবিত করতে না পারেন, সে জন্য তাঁরা যখন সরকারের সাথে আলোচনা করতে গেছেন তখনও তাঁরা সরকারের দেওয়া খাবার স্পর্শ করেননি। আন্দোলনকে বিপথগামী করতে সরকার সুপ্রিম কোর্টের মাধ্যমে আইনকে কিছু দিনের জন্য স্থগিত ঘোষণা করে পর্যালোচনার জন্য কমিটি ঘোষণা করেছে। কিন্তু আইনি রাস্তাকে সম্পূর্ণ পরিহার করে কৃষকরা গভীর প্রত্যয়ে ঘোষণা করেছেন, আইন এনেছে সরকার। আলোচনা যা হবে সরকারের সঙ্গে। এখানে বিচারব্যবস্থার ভূমিকা কোথায়!

মনে পড়ে যায় কৃষক আন্দোলনের আর এক গৌরবময় ক্ষেত্র সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের কথা। সেই আন্দোলনেও এমন করেই সাধারণ

অত্যাচারের সামনে অকুতোভয়

কৃষকরা পুরুষ-নারী নির্বিশেষে সামিল হয়ে গড়ে তুলেছিলেন আন্দোলনের গণকমিটি। এস ইউ সি আই (সি)-র তৎকালীন রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ আন্দোলনরত কৃষকদের উদ্দেশে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছিলেন, আপনারা নিজেরা আলোচনা করুন, নিজেরা সিদ্ধান্ত নিন। রাজনৈতিক নেতাদের পরামর্শ শুনবেন কিন্তু সিদ্ধান্ত নেবেন নিজেরা। এই আন্দোলনেও আমরা দেখলাম, কৃষকরা কোনও নামকরা নেতার পিছনে গিয়ে জড়ো হননি। সরকারি কোনও প্রলোভনেও পা দেননি। জয় অর্জনই ছিল তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য। সেই জয় তাঁরা অর্জন করেছেন। অর্জন করেছেন নিজেদের শক্তির জোরে, লক্ষ্যের প্রতি অটলতার জোরে, দাবির প্রতি অনমনীয়তার জোরে। কোনও প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব ছাড়াই। তাঁরা প্রমাণ করেছেন, গণআন্দোলনের শক্তি একটা চরম উদ্ধত সরকারের মাথাও এমন করে নত করে দিতে পারে।

সরকারের চরম ঔদ্ধত্য ও অসংবেদনশীলতা সত্ত্বেও এই জয় অর্জিত হতে পারত আরও অনেক আগে। এখন যে রাজনৈতিক দলগুলি এই জয়ের সাফল্য আত্মসাৎ করতে ঢাক-ঢোল নিয়ে রাস্তায় নেমে পড়েছে তারা যদি আন্দোলন জোরদার করতে, দেশের প্রান্তে প্রান্তে আন্দোলনের বার্তাকে পৌঁছে দিতে কার্যকরী ভূমিকা পালন করত। বাস্তবে সংবাদমাধ্যমে প্রচার পাওয়া এই সব দলগুলি কেউই কৃষিআইন প্রত্যাহারের আন্দোলনকে প্রয়োজনীয় গুরুত্ব দেয়নি। কংগ্রেসের কথা বোঝা যায়। তারা এ দেশে বুর্জোয়া স্বার্থের বিশ্বস্ত প্রতিনিধি। কৃষিআইনের মধ্য দিয়ে কৃষিকে একচেটিয়া পুঁজির কুক্ষিগত করার যে প্রচেষ্টা, তার পূর্বসূরি, পথনির্দেশক তারাই। তাই শুকনো কিছু বিবৃতি আর টুইটের বাইরে তারা কিছু করেনি। অন্য আঞ্চলিক দলগুলি সম্বন্ধেও একই কথা খাটে।

কিন্তু বামপন্থী বলে পরিচিত সিপিএম কেন কৃষক স্বার্থে

পাঁচের পাতায় দেখুন

বর্ধমান শহরে মিছিল। ১৯ নভেম্বর

এস ইউ সি আই (সি)-র তৎকালীন রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের আন্দোলনরত কৃষকদের উদ্দেশে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন, আপনারা নিজেরা আলোচনা করুন, নিজেরা সিদ্ধান্ত নিন। রাজনৈতিক নেতাদের পরামর্শ শুনবেন কিন্তু সিদ্ধান্ত নেবেন নিজেরা। এই আন্দোলনেও আমরা দেখলাম, কৃষকরা কোনও নামকরা নেতার পিছনে গিয়ে জড়ো হননি। সরকারি কোনও প্রলোভনেও পা দেননি।

গণআন্দোলনই পারে

চারের পাতার পর

প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করল না? তারা কেরালায় সরকারে আছে, নয় নয় করে অন্তত পশ্চিমবঙ্গে তাদের যতটুকু সমর্থন কৃষকদের মধ্যে এখনও টিকে আছে তাদের সংগঠিত করে কেন তারা পরিপূরক আন্দোলন এই দুটি রাজ্যে অন্তত গড়ে তুললেন না? আসলে কংগ্রেসের মতো তাদেরও উপায় নেই। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের ইতিহাস তাদের তাড়া করছে। দেশি-বিদেশি একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থে কৃষকের জমি

২২ নভেম্বর লক্ষ্ণৌতে সংযুক্ত কিসান মোর্চার ডাকে মহাপঞ্চায়েতে কৃষক জমায়েতের একাংশ

কেড়ে নিতে তারা গুলি চালিয়ে কৃষকদের হত্যা করেছে, নজিরবিহীন ভাবে মহিলা আন্দোলনকারীদের ধর্ষণ করিয়েছে। যদিও কৃষকদের জয় তারা আটকাতে পারেনি। অন্য দিকে রয়েছে পুঁজিপতি শ্রেণির সঙ্গে তাদের যোজসাজশ। এই যোগসাজশেই তো তারা আজও বুর্জোয়া মিডিয়ায় ভেসে রয়েছে। তাই পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থের বিরুদ্ধে গিয়ে বলিষ্ঠভাবে কিছু করার ক্ষমতা তাদের নেই। এ রাজ্যের মানুষ তাদের অভিজ্ঞতায় দেখেছেন, কৃষক মোর্চার দেওয়া কর্মসূচিগুলিকে তারা প্রয়োজনীয় গুরুত্ব দেয়নি। ২৭ সেপ্টেম্বরের ভারত বনধ তার জ্বলন্ত উদাহরণ। এস ইউ সি আই (সি) তার সর্বশক্তি নিয়োগ করে যখন বনধ সফল করার জন্য নেমেছিল, তখন তারা কাগুজে বিবৃতি দিয়েই দায়িত্ব শেষ করেছে। তারা যে আপসহীন লড়াইয়ে গুরুত্ব দেয়নি তার অকাট্য প্রমাণ— তাদের দলের সাধারণ সম্পাদকের একটি প্রস্তাব। তিনি গত ৩১ ডিসেম্বর দ্য হিন্দু পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখে প্রস্তাব দিয়েছিলেন, কৃষক আন্দোলনের ফয়সালা করতে কৃষক নেতারা সরকার এবং দেশের একচেটিয়া পুঁজিপতিদের সাথে বৈঠকে বসুক। স্বাভাবিক ভাবেই আন্দোলনের ময়দান থেকে প্রশ্ন উঠেছে, বৈঠকে পুঁজিপতিদের রাখার এমন প্রস্তাব কেন? বুঝতে অসুবিধা হয়নি, অন্দোলনে নাম কা ওয়াস্তে থেকে আসলে তারা কার প্রতিনিধিত্ব করছে।

এ রাজ্যে তৃণমূল সরকারের চরিত্রটিও এই কৃষক আন্দোলন বেআব্রু করে দিয়েছে। তাদের নেত্রী মুখে কৃষি আইনের বিরোধিতা করছি বললেও বাস্তবে আন্দোলনকে শক্তিশালী করতে তাঁর দল বা সরকার কিছু করেনি শুধু নয়, বাধা দিয়েছে। কৃষক মোর্চা যতগুলি সর্বভারতীয় ধর্মঘট ডেকেছে এ রাজ্যে সবগুলির বিরোধিতা করেছে তৃণমূল সরকার। এমনকি কর্মসূচি সফল করতে গিয়ে তৃণমূল সরকারের পুলিশ এস ইউ সি আই (সি) কর্মীদের গ্রেফতার করে জেলে ভরেছে।

লক্ষ্ণৌতে মহাপঞ্চায়েতে বক্তব্য রাখছেন এআইকেকেএমএস নেতা কমরেড সত্যবান

এই আন্দোলন আরও একটি শিক্ষা মানুষের সামনে রেখে গেল। এতদিন নাগরিক সমাজ বলতে বোঝাত সমাজের শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী অংশকে। এনআরসি বিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু করে কৃষক আন্দোলন দেখাল সমাজের কোনও নির্দিষ্ট অংশ নয়, লড়াকু জনতাই নাগরিক সমাজ। শোষিত নিপীড়িত জনতা চেতনার ভিত্তিতে দাঁড়ালে তারা নিজেরাই পারে আন্দোলন গড়ে তুলতে, নেতৃত্ব দিতে, জয় ছিনিয়ে আনতে।

গোটা দেশ জুড়ে সাধারণ মানুষের জীবনের পরিস্থিতি যে ভয়ঙ্কর আকার নিয়েছে তাতে বহু মূল্যে অর্জিত এই ঐতিহাসিক জয়ের গুরুত্ব বিরাট। মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে সাধারণ মানুষের দুর্দশা। ধনী-দরিদ্রে বৈষম্য আকাশ ছুঁয়েছে। সরকারি ভাণ্ডারে খাদ্য উপচে পড়লেও ক্ষুধা এবং অপুষ্টি দেশে গুরুতর আকার নিয়েছে। চিকিৎসা অধিকাংশ মানুষের কাছেই অধরা। একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থে সরকার বেপরোয়া বেসরকারিকরণ এবং শ্রম আইনের বদল কোটি কোটি শ্রমিক কর্মচারীর জীবনকে অনিশ্চিত অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিয়েছে। বিরাট অংশের মানুষ যখন আজ হতাশার আচ্ছন্ন, তখন এই জয় তাদের নতুন জীবনীশক্তিতে উজ্জীবিত করে তুলবে। মালিক শ্রেণির হিংস্র আক্রমণের সামনে দাঁড়িয়ে দেশের কোটি কোটি শ্রমিক যখন আত্মসমর্পণই ভবিতব্য বলে ভাবতে শুরু করেছিলেন তখন এই জয় তাদের সামনে আলোকবর্তিকার কাজ করছে। তাঁরা নতুন উজ্জীবিত শক্তিতে ভাবছেন, পথ আছে। আন্দোলনই সেই পথ।

লক্ষ্ণৌতে মহাপঞ্চায়েতের মঞ্চে এআইকেকেএমএস নেতা কমরেড শঙ্কর ঘোষ (মাঝে)

কৃষক আন্দোলনের বিজয় অভূতপূর্ব

এআইকেকেএমএস

দিল্লির ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলনের ঐক্যমঞ্চ সংযুক্ত কিসান মোর্চার অন্যতম শরিক এআইকেকেএমএস-এর সর্বভারতীয় সভাপতি কমরেড সত্যবান ও সাধারণ সম্পাদক কমরেড শঙ্কর ঘোষ ১৯ নভেম্বর এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আদানি-আম্বানির স্বার্থবাহী তিন কালা কানুন প্রত্যাহার করার যে ঘোষণা করেছেন তাকে এআইকেকেএমএস দেশের সংগ্রামী কৃষক সহ সর্বস্তরের জনগণের অভূতপূর্ব বিজয় বলে তাদের অভিনন্দন জানাচ্ছে। এই বিজয় অর্জনের জন্য সাতশো কৃষককে আত্মবলিদান দিতে হয়েছে। বিজেপি সরকারের লাঠি-গুলি-টিয়ারগ্যাসকে অগ্রাহ্য করে, শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষার পরোয়া না করে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হয়েছে। এই আন্দোলন দুনিয়ার গণআন্দোলনের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল উদাহরণ হিসাবে বহুদিন ধরে মেহনতি মানুষের হৃদয়ে প্রেরণা যোগাবে।

তাঁরা বলেন, আমরা মনে করি প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা যথেষ্ট নয়। উপযুক্ত আইনি প্রক্রিয়া অবলম্বন করে এই ঘোষণার বাস্তবায়ন করতে হবে, সাথে সাথে বিদ্যুৎ বিল-২০২১ প্রত্যাহার, এমএসপি আইনসম্মত করা ও কৃষকদের কাছ থেকে কৃষিপণ্য কেনার সরকারি ব্যবস্থা করতে হবে। এই সব দাবির ভিত্তিতেই কৃষকরা এক বছর ধরে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। সংগ্রামী কৃষকদের এই বিজয় আবারও প্রমাণ করল, জনগণই শেষ কথা বলে। তারাই পারে স্বৈরাচারী শাসকদের সমস্ত দম্ভকে চূর্ণ করে ইতিহাসের চাকাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে। সংগ্রামে পূর্ণ বিজয় না হওয়া পর্যন্ত আমরা এই আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার শপথ গ্রহণ করছি।

শ্রমিক সংগঠন এআইইউটিইউসি-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড শঙ্কর দাশগুপ্ত এক বিবৃতিতে সংগ্রামী কৃষকদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, এই বিজয় দেশে শ্রমিক কৃষক ঐক্যকে সুদৃঢ় করবে এবং ফ্যাসিস্ট শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনকে শক্তিশালী করবে।

এই আন্দোলনে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার চিকিৎসা পরিষেবা দিয়ে গেছে। সংগঠনের সর্বভারতীয় সভাপতি ডাঃ বিনায়ক নারলিকার এবং সাধারণ সম্পাদক ডাঃ বিজ্ঞান বেরা এক বিবৃতিতে বলেন, আমরা গর্বিত যে, এই মহৎ সংগ্রামে আমরা শুরু থেকেই চাষিদের পাশে ছিলাম। এই বিজয় স্বাস্থ্যব্যবস্থার বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে এবং জনমুখী স্বাস্থ্যআন্দোলন গড়ে তুলতে বিশেষভাবে সাহায্য করবে।

অভিনন্দন বুদ্ধিজীবী মঞ্চের

"গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সুশীল সমাজ তাদের সচেতন কর্তব্য পালন করে যাবেই, সরকারি ফতোয়া বা দেশবিরোধী বানানোর চক্রান্ত পরাভূত হবে। কৃষক সমাজ, শ্রমজীবী মেহনতি মানুষ ও সুশীল সমাজের যে সমস্ত প্রতিনিধি দিল্লির এই কৃষক আন্দোলনের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন আমরা তাঁদের সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই" — ১৯ নভেম্বর এক বিবৃতিতে এ কথা বলেন শিল্পী-সাংস্কৃতিক কর্মী-বুদ্ধিজীবী মঞ্চের সভাপতি বিভাস চক্রবর্তী এবং সম্পাদক দিলীপ চক্রবর্তী। বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেছেন মীরাতুন নাহার, বিমল চ্যাটার্জী, প্রতুল মুখোপাধ্যায়, অপর্ণা সেন, পার্থসারথী সেনগুপ্ত, সুজাত ভদ্র, তরুণ নস্কর, কৌশিক সেন, ধ্রুবজ্যোতি মুখার্জী, তরুণ মণ্ডল, কবির সুমন, রূপশ্রী কাহালি, পল্লব কীর্তনীয়া, সুদীপ্ত দাশগুপ্ত, নিরঞ্জন প্রধান, পবিত্র গুপ্ত, সান্টু গুপ্ত, অজয় চ্যাটার্জী, অসীম গিরি, আফরোজা খাতুন, অমিতাভ দত্ত, সৌমিত্র ব্যানার্জী, অশোক সামন্ত প্রমুখ। তাঁরা সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের আর এক ঐতিহাসিক যুগান্তকারী আন্দোলনকে (২০০৬-২০০৮) স্মরণ করে বলেছেন — "ওই আন্দোলনেও বহু অত্যাচার, জুলুম, কৃষকদের সহ্য করতে হয়েছিল, অনেকে শাসকের অত্যাচারে শহিদের মৃত্যুবরণ করেছিলেন, বুদ্ধিজীবী সমাজকেও শাসকদের রোষে পড়তে হয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সংগ্রামী কৃষকরাই জয়ী হয়েছিলেন। কেন্দ্রের মোদি সরকার কৃষি আইন প্রত্যাহার করলেও, বিদ্যুৎ আইন এখনও প্রত্যাহার করেনি, আন্দোলনে মৃত শহিদদের জীবনও তারা ফিরিয়ে দিতে পারবে না।"

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে শহিদবেদিতে আন্দোলনের শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করছেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড অশোক সামন্ত। ১৯ নভেম্বর

সাম্রাজ্যবাদের মদতপুষ্ট অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে
রাজপথে সুদানের সাহসী জনসাধারণ

মিলিটারির বন্দুকের মুখে দাঁড়িয়ে লড়ছেন সুদানের সাধারণ মানুষ। গত ২৫ অক্টোবর সেনাবাহিনির এক কর্তা জেনারেল আবদেল ফাতাহ আল-বুরহান কর্তৃক ক্ষমতা দখলের বিরুদ্ধে সেদেশের মানুষ পথে নেমে দিনের পর দিন বিক্ষোভ আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন।

তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস, সোনা সহ মূল্যবান নানা প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ উত্তর আফ্রিকার দেশ সুদান। লোহিত সাগরের তীরে অবস্থিত এই দেশের অবস্থানটিও ভূ-রাজনৈতিক ভাবে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। ফলে সাম্রাজ্যবাদী নানা দেশ, বিশেষত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের লোলুপ দৃষ্টি বহুদিন থেকেই রয়েছে সুদানের ওপর। দীর্ঘদিন ধরে দেশটি ছিল জেনারেল ওমর আল বশিরের স্বৈরাচারী শাসনের অধীন। আর্থিক অভাব-অনটন, ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধি, প্রশাসনিক দুর্নীতি ইত্যাদি কারণে এক সময় প্রেসিডেন্ট বশিরের বিরুদ্ধে জনরোষ ফুঁসে ওঠে।

২০১৮-র ডিসেম্বরে সুদানের শ্রমিক, চাষি, ছোট ব্যবসায়ী এবং দেশের রাজনৈতিক দলগুলি ও বেশ কিছু শ্রমিক সংগঠন ব্যাপক ভাবে পথে নামে বশির-সরকারের বিরুদ্ধে। সুদানের কমিউনিস্ট পার্টি (এসসিপি) এবং সেখানকার শিক্ষক, স্বাস্থ্যকর্মী, সরকারি কর্মচারীদের সংগঠন এসপিএ-র ডাকে গোটা দেশের সাধারণ মানুষ স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনে যোগ দেয়। সামরিক বাহিনির একটি গোষ্ঠীও যোগ দেয় তাদের সঙ্গে। প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে এই আন্দোলনে যদিও হাজার হাজার জনতা যুক্ত হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কয়েকটি রাজনৈতিক দল ও ব্যবসায়ীদের জোট সামরিক বাহিনির ওই গোষ্ঠীটির সঙ্গে একযোগে নেতৃত্বে চলে আসে। তৈরি হয় একটি সার্বভৌম কাউন্সিল। ২০১৯-এর গ্রেপ্তার হন প্রেসিডেন্ট বশির এবং অন্তর্বর্তী সরকার হিসাবে শাসন ক্ষমতায় বসে ওই সার্বভৌম কাউন্সিল। সামরিক গোষ্ঠীর উপস্থিতির কারণে এসসিপি, এসপিএ এবং বেশিরভাগ শ্রমিক সংগঠনগুলি সরকারে যোগ দেয়নি। প্রধানমন্ত্রী হন আবদুল্লাহ হামদক। সিদ্ধান্ত হয়, অন্তর্বর্তী এই সরকার ২০২২-এর মধ্যে

নির্বাচনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক সরকার গড়ার দিকে এগোবে। কিন্তু তার আগেই গত ২৫ অক্টোবর সামরিক বাহিনির এক কর্তা জেনারেল বুরহান নিজেকে সার্বভৌম কাউন্সিলের প্রধান ঘোষণা করে সরকারি ক্ষমতা দখল করেন।

এই অভ্যুত্থানকে সমর্থন করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও এই এলাকায় তার সহযোগী সৌদি আরব, বাহারিন, সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর মতো দেশগুলি। গ্রেপ্তার হন হামদক এবং মন্ত্রীসভার অধিকাংশ অসামরিক সদস্য সহ অন্যান্য নেতারা। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এই অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে অসামরিক সরকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবিতে আন্দোলনের ডাক দেয় এসসিপি ও তাদের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিক সংগঠনগুলি এবং এসপিএ। ধর্মঘট ও আইন-অমান্যের পাশাপাশি নিরস্ত্র গণআন্দোলনকেই প্রতিবাদের পথ হিসাবে বেছে নেয় তারা। কিন্তু হিংস্র সামরিক বাহিনি নিরস্ত্র জনতাকে রেহাই দেয়নি। নির্বিচারে গ্রেপ্তার, কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটানো, পথসভাগুলি ভেঙে দেওয়া, এমনকি সরাসরি গুলি চালিয়েও আন্দোলন ভাঙতে চাইছে তারা। বন্ধ করে দিয়েছে ইন্টারনেট ও টেলিফোন যোগাযোগ। তবুও হঠানো যায়নি আন্দোলনকারীদের। পথে নেমে লাগাতার বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন মানুষ। ধর্মঘটে স্তব্ধ করে দিচ্ছেন গোটা দেশ।

গত ১৭ নভেম্বর দেশ জুড়ে বিক্ষোভ মিছিলের ডাক দেওয়া হয়েছিল। বুরহান সরকারকে সমর্থন করার সাম্রাজ্যবাদী সুপারিশ অগ্রাহ্য করে 'অভ্যুত্থানকারীদের সঙ্গে কোনও আলোচনা নয়', 'কোনও ক্ষমতা-ভাগাভাগি নয়' এবং 'সেনাকর্তাদের সঙ্গে কোনও আপস নয়'— এই স্লোগান তুলে এ দিনের বিক্ষোভ মিছিলে যোগ দেন দেশের অন্তত ১৬টি শহরের লক্ষ লক্ষ মানুষ।

এদিনও পুলিশ ও মিলিটারি ঝাঁপিয়ে পড়ে শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্র বিক্ষোভকারীদের ওপর। শুধু এ দিনই মারা যান কমপক্ষে ১৫ জন আন্দোলনকারী। প্রায় এক মাস ধরে চলা এই আন্দোলনে মৃতের সংখ্যা এই নিয়ে পৌঁছয় ৩৯-এ। আহত অসংখ্য। মাথায় ও শরীরে বুলেটের গুরুতর আঘাত নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি বহু মানুষ। আশঙ্কা, মৃতের সংখ্যা হয়ত আরও বাড়বে। কিন্তু হাল ছাড়তে রাজি নন সুদানের সাহসী জনসাধারণ। এসসিপি এবং এসপিএ সহ আন্দোলনকারী সংগঠনগুলির আহ্বানে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সমর্থনপুষ্ট এই সামরিক অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে লড়াই জারি রাখার শপথ নিয়েছেন তাঁরা।

জীবনাবসান

দক্ষিণ ২৪ পরগণার জয়নগর থানার নারায়ণীতলা অঞ্চলের এসইউসিআই (সি) সদস্য কমরেড সমর বৈদ্য (টুনুদা) দীর্ঘ রোগভোগের পর ৯ নভেম্বর শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর। সত্তরের দশকে মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের আদর্শে অনুপ্রাণিত

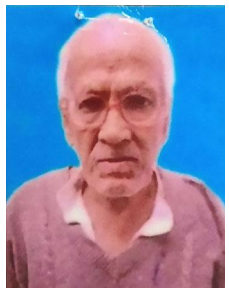

হয়ে তিনি দলের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন। দলের কর্মসূচি রূপায়ণ অথবা স্থানীয় সমস্যা নিয়ে গণআন্দোলন পরিচালনায় তিনি প্রথম সারিতে থাকতেন। এলাকার গরিব জনসাধারণ এবং দলের কর্মীদের কাছে তিনি ছিলেন আপনজন। অসুস্থতার মধ্যেও দলের খবর সব সময় নিতেন ও গণদাবী পড়তেন। তিনি তাঁর পরিবারের সদস্য ও আত্মীয়দের দলের সঙ্গে যুক্ত করেছেন। এলাকায় সংগঠনের বিস্তারের বিশেষ ভূমিকা ছিল। এলাকায় সংগঠনের বিস্তারে তিনি বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন। ওনার মৃত্যুর খবর পেয়ে দলের জেলা কমিটির সদস্য পিন্টু ঘোষ, দিব্যেন্দু ঘোষ, অমরনাথ ঢালি সহ অন্যরা তাঁর মরদেহে মাল্যদান করেন। তাঁর মৃত্যুতে পার্টি একজন নিষ্ঠাবান কর্মীকে হারাল।

কমরেড সমর বৈদ্য লাল সেলাম

বাঁকুড়া জেলার হিড়বাঁধ এলাকার এস ইউ সি আই (সি) কর্মী কমরেড সিরাজ মুদি মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণজনিত সমস্যা নিয়ে ১ অক্টোবর বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি হন। ৭ অক্টোবর তিনি প্রয়াত হন। তার বয়স হয়েছিল ৪৭ বছর।

নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি সময় কমরেড সিরাজ এসইউসিআই (সি) দলের সংস্পর্শে আসেন। হিড়বাঁধ ব্লক এলাকায় তখন সবে পার্টি সংগঠন গড়ে তোলার কাজ শুরু হয়েছে। পরবর্তী সময়ে তার গ্রামের পাড়ায় পাড়ায় পার্টি কর্মী-সমর্থকদের সংগঠিত করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। স্বল্পভাষী সিরাজ সেই কাজ নীরবে নিষ্ঠার সঙ্গে করে গিয়েছেন। মতপার্থক্য হলেও তিনি সুসম্পর্ক রক্ষা করে যেতে পারতেন। প্রতিবেশীদের বিপদে-আপদে দিনে-রাত্রে যে কোনও সময় ডাকলেই তিনি পৌঁছে যেতেন। শান্ত মধুর স্বভাবের গুণে তিনি প্রতিবেশী, দলীয় কর্মী-সমর্থক সকলের শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পাত্র ছিলেন।

তাঁর অকাল প্রয়াণে দল একজন সম্ভাবনাময় কমরেডকে হারাল। তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ২ নভেম্বর তাঁর গ্রাম মিরগীতে স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় এলাকার কর্মী-সমর্থক, গ্রামবাসীরা, অন্য দলের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। সভায় রাজ্য কমিটির সদস্য ও জেলা সম্পাদক কমরেড জয়দেব পাল, জেলা কমিটির সদস্য কমরেড নরেন্দ্রনাথ কুম্ভকার, কমরেড অসিত মণ্ডল সহ সিরাজের সহকর্মী কমরেডরা স্মৃতিচারণায় অংশ নেন। সভাপতিত্ব করেন শিক্ষক কমরেড গৌতম কুমার মুদি।

কমরেড সিরাজ মুদি লাল সেলাম

ছাত্রদের রাজনৈতিক অনুশীলন শিবির

এআইডিএসও পূর্ব মেদিনীপুর জেলা কমিটির উদ্যোগে ৯ নভেম্বর মেছেদা বিদ্যাসাগর হলে 'মার্ক্সবাদী দর্শন ও মানব সমাজ-সভ্যতার ক্রমবিকাশ' বিষয়ে রাজনৈতিক অনুশীলন শিবির হয়। দেড় শতাধিক ছাত্রকর্মীর এই শিবিরে প্রারম্ভিক আলোচনা করেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক কমরেড মণিশঙ্কর পট্টনায়ক। এরপর জেলার বিভিন্ন স্কুল-কলেজ থেকে আগত প্রতিনিধিরা আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

সমাপ্তি অধিবেশনে আলোচনা করেন সংগঠনের প্রাক্তন সর্বভারতীয় সভাপতি ও এস ইউ সি আই (সি)-র রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড কমল সাঁই। উপস্থিত ছিলেন দলের জেলা সম্পাদক ও রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড অনুরূপা দাস সহ অন্যান্য জেলা নেতৃবৃন্দ।

চাকরির পরীক্ষায় দুর্নীতি

একের পাতার পর

সংবাদে প্রকাশ, রাজ্যের স্কুল সার্ভিস কমিশন আদালতে জানিয়েছে তাদের সুপারিশে যারা গত এক বছরেরও বেশি সময় ধরে সবেতন চাকরি করছে, তাদের নিয়োগের কোনও তথ্য কমিশনের কাছে নেই। সংখ্যাটি এই মুহূর্তে ২৫ জন। মলয় পাল বলেন, মধ্যপ্রদেশে বিজেপি সরকারের ব্যাপম কেলেঙ্কারির মতো ঘটনা। অবিলম্বে দোষীদের শাস্তি দিতে হবে। এই দাবিতে ২০ নভেম্বর পশ্চিম মেদিনীপুরের বেলদাতে প্রতিবাদ মিছিল সংগঠিত হয়।

মিছিল কেশিয়াড়ি মোড় থেকে শুরু হয়ে বেলদা শহর পরিক্রমা করে। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক মলয় পাল, রাজ্য নেতৃত্ব সুকান্ত সিকদার, জেলা সম্পাদক সুশান্ত পানিগ্রাহী, অনিন্দিতা জানা সহ আরও অনেকে। পেট্রোপণ্যের মূল্য না কমিয়ে মদের দাম কমানোর বিরুদ্ধেও সোচ্চার হয় মিছিল। কৃষি আইন প্রত্যাহারে কৃষক আন্দোলনের জয়কে কুর্ণিশ জানানো হয় সংগঠনের পক্ষ থেকে।

প্রধানমন্ত্রীর কাছে জবাব চাইছেন সাধারণ মানুষ

নোট বাতিলের পাঁচ বছর

২০১৪ সালে লোকসভা ভোটের ঠিক আগে নরেন্দ্র মোদি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, ক্ষমতায় এলে সমস্ত কালো টাকা উদ্ধার করে এনে সকলের অ্যাকাউন্টে বিলি করে দেবেন। দেশের বিরাট অংশের মানুষ সে কথা বিশ্বাস করেছিলেন। দু'বছর পর ২০১৬-র ৮ নভেম্বর আচমকা যখন তিনি ঘোষণা করলেন, অচল হয়ে যাবে পাঁচশো ও হাজার টাকার নোট, অবাক হলেও ভরসা হারাননি মানুষ। ভেবেছিলেন, এইবার কালো টাকার ধনী কারবারিরা শায়েস্তা হবে। দুর্নীতি দূর হবে। নকল নোট বাজার থেকে হটে যাবে। ভেবেছিলেন সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপেও ভাটা পড়বে। কারণ নরেন্দ্র মোদি আশ্বাস দিয়েছিলেন, নোট বাতিল হলে সন্ত্রাসী সংগঠনগুলির টাকার জোগান বন্ধ হবে। সেইসব আশ্বাসবাণীতে ভরসা করেই দেশের বিশ্বাসপ্রবণ সাধারণ মানুষ নোট বাতিলের দিনগুলিতে অশেষ যন্ত্রণা সয়েও ধৈর্য হারাননি। ব্যাঙ্কের লাইনে ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে প্রাণ গিয়েছে ১১৫ জনের। আচমকা অপরিকল্পিত নোট বাতিলের এই সরকারি সিদ্ধান্তে জনজীবনে নেমে আসা দুর্দশার প্রতিবাদে এস ইউ সি আই (সি) সেই সময় পথে নেমে বার বার বিক্ষোভ দেখিয়েছিল। বলেছিল, কালো টাকার উৎস পচা-গলা এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা বহাল রেখে শুধু নোট বাতিল করে কালো টাকা দূর করা যায় না। প্রতিবাদ করার আহ্বান জানালে প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্তের ওপর আস্থা রাখার অনুরোধ জানিয়েছিলেন অনেকে।

নোট বাতিলের সুফল সামনে আসার জন্য ৫০ দিন সময় চেয়েছিলেন মোদিজি। কেটে গেছে পাঁচ-পাঁচটা বছর। কালো টাকার সমান্তরাল অর্থনীতি দেশে বহাল তবিয়তে বিরাজ করছে। চালু থাকা কালো টাকার প্রায় সমস্তটাই রূপ বদলে ব্যাঙ্কে ফিরে এসেছে। শুধু তাই নয়, নোট বাতিলের সময় নতুন যে দু'হাজার টাকার নোট চালু করেছিল মোদি সরকার, ২০২০ সালের তথ্য বলছে, দেশের মোট নকল নোটের ৬০ শতাংশই রয়েছে সেই দু'হাজারেরই নোটে। নোট বাতিলের পরেও একের পর এক সন্ত্রাসবাদী হামলার ঘটনা ঘটেছে নানা জায়গায়। মোদিজি এ-ও বলেছিলেন, নোট বাতিল করে নগদহীন অর্থনীতি চালু করবেন তিনি, যেখানে অধিকাংশ লেনদেন হবে অনলাইনে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তথ্যে দেখা যাচ্ছে, দেশের মানুষের হাতে নোট বাতিলের সময়কার তুলনায় এ বছরের অক্টোবরে ১০.৩৩ লক্ষ কোটি টাকা বেশি নগদ অর্থ রয়েছে। অর্থাৎ নগদেই মূলত লেনদেন করছেন দেশের মানুষ। সব মিলিয়ে সকল দেশবাসীর কাছেই এ কথা আজ পরিষ্কার যে মোদিজির সমস্ত প্রতিশ্রুতিগুলিই ছিল ফাঁকা আওয়াজ এবং নোট বাতিলের গোটা কর্মসূচিটাই ছিল জনসাধারণের সঙ্গে একটা নিষ্ঠুর ঠাট্টা মাত্র।

প্রশ্ন হল, কেন এমন পদক্ষেপ নিয়েছিলেন নরেন্দ্র মোদি? কালো টাকার বেশির ভাগ অংশ যে নোটের আকারে থাকে না, থাকে বেনামি জমি, বাড়ি, মূল্যবান ধাতু, রত্নের আকারে— ফলে নোট বাতিলের মাধ্যমে তা উদ্ধার করা যায় না— অর্থনীতির এই গোড়ার কথা প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর সহযোগীদের জানা ছিল না, তা কি সম্ভব? ভারতের মতো দেশে যেখানে বিরাট অংশের মানুষের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টই নেই, সেখানে নগদহীন লেনদেনের খোয়াব দেখানোর পিছনে আসলে কী উদ্দেশ্য ছিল তাঁদের?

নোট বাতিলের পাঁচ বছর পরেও মোদিজি কিংবা তাঁর সরকারের কর্তাদের দেশের মানুষের এই সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার মতো সাহস নেই। অথচ, এদেশের অধিকাংশ মানুষের রুজি-রুটি জোগায় যে অসংগঠিত ক্ষেত্রটি, প্রধানমন্ত্রীর 'তুঘলকি' সিদ্ধান্তে ভেঙে পড়েছিল নগদ টাকার ওপর নির্ভরশীল সেই ক্ষেত্রটি। নগদ টাকার অভাবে কাজ হারিয়েছিলেন কোটি কোটি মানুষ। নাভিশ্বাস উঠেছিল ছোট ব্যবসায়ী ও দোকানদারদের। তাঁদের বড় অংশই আর উঠে দাঁড়াতে পারেননি। কৃষিক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত বিপুল সংখ্যক মানুষের জীবনেও নেমে এসেছিল অন্ধকার। নগদের অভাবে চাষিরা বিক্রি করতে পারেননি তাঁদের ফসল। কিনতে পারেননি পরবর্তী রবিশস্যের বীজ, সার, কীটনাশক। ঋণের ফাঁসে দমবন্ধ হয়ে মরেছেন খেটে-খাওয়া মানুষ। আজও অর্থনীতির ভাঙা হাল। আজও ছোট শিল্পের উৎপাদন, ছোট ব্যবসা প্রভৃতি নোট বাতিলের আঘাত সামলে উঠতে পারেনি।

একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা যায়, নানা ভাবে বৃহৎ পুঁজির মালিকদের সুবিধা করে দিতেই নোট বাতিলের আচমকা সিদ্ধান্তটির যাবতীয় দায় গরিব খেটে-খাওয়া মানুষের কাঁধে এভাবে চাপিয়ে দিয়েছিল বিজেপি সরকার। আম্বানি, আদানিদের মতো মোদিজির স্নেহধন্য বৃহৎ পুঁজিপতিদের সম্পদের সামান্য অংশই যেহেতু নগদে থাকে, তাই তাঁদের গায়ে নোট বাতিলের সামান্য আঁচও লাগেনি। কারণ, শেয়ার বাজার, জমিজায়গার ব্যবসা, বিদেশি ব্যাঙ্কের আমানত, বন্ড ইত্যাদিতে নিয়োজিত এইসব ধনকুবেরদের সম্পদ নোট বাতিলের ফলে ক্ষতির মুখে পড়েনি। বরং নোট বাতিলের কারণে ব্যাঙ্কে জমা পড়া নগদ টাকার পাহাড় পরবর্তী সময়ে সহজে ব্যাঙ্কঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রে এঁদের সুবিধাই করে দিয়েছে। পাশাপাশি, নোট বাতিলের ফাঁদে পড়ে ছোট ব্যবসাপত্রের সর্বনাশ হয়ে যাওয়ায় পৌষমাস দেখেছেন বড় পুঁজির মালিকরা। ছোট-মাঝারি ব্যবসার ফাঁকা বাজারের দখল নিয়েছেন তাঁরা। ফুলে-ফেঁপে উঠেছে বিগবাজার, স্পেনসার্স, অ্যামাজন, ফ্লিপকার্ট, বিগ বাস্কেটের মতো সংগঠিত খুচরো বিপণনকারীদের বড় পুঁজির ব্যবসা। ভারতের ব্যবসায়ীদের সংগঠন কনফেডারেশন অফ অল ইন্ডিয়া ট্রেডার্স-এর সেক্রেটারি জেনারেল যখন জানিয়েছিলেন, নগদ সংকটে গোটা দেশের বাজারে কেনাবেচার পরিমাণ ৬০ শতাংশ কমে গিয়েছে, ঠিক সেই সময়ে অনলাইনে মুদিখানার পণ্য বেচার সংস্থা বিগ বাস্কেট-এর এক বড়কর্তা জানান, তাঁদের বিক্রি ৪০ শতাংশ বেড়ে গিয়েছে। আর এক অনলাইন মুদিখানা ব্যবসায়ী গ্রোফার্সের এক অধিকারিক বলেন, নোট বাতিলের পর তাঁদের বিক্রি ৩০ থেকে ৩৫ শতাংশ বেড়েছে, আর দৈনিক অর্ডার বেড়ে গেছে ২০ শতাংশ। (এই সময়, ১০.১২.২০১৬)।

শুধু কি তাই! নানা ঘটনায় এ কথা আজ পরিষ্কার যে, জনসাধারণ না জানলেও বিজেপি-ঘনিষ্ঠ শিল্পপতিরা ও দলের ধনী নেতারা অনেক আগে থেকেই জানতেন নোট বাতিলের কথা। গুজরাটে বিজেপির প্রাক্তন মন্ত্রী যতীন ওঝা স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখে এ ব্যাপারে অভিযোগ করেছিলেন। এরপর নরেন্দ্র মোদির নোট বাতিলের সিদ্ধান্তের আসল উদ্দেশ্য বুঝতে সামান্য অসুবিধাও হয় কি?

নোট বাতিলের পিছনে আরও একটি উদ্দেশ্য ছিল। ঠিক তার পরের বছর ছিল উত্তরপ্রদেশ সহ পাঁচ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। সেই নির্বাচনে বিজেপির হয়ে জনসমর্থন জোগাড় করার দায় ছিল নরেন্দ্র মোদির। এই অবস্থায় দেশের মানুষের সামনে নিজের দুর্নীতিবিরোধী কঠিন-কঠোর ভাবমূর্তি নির্মাণে নোট বাতিলকে হাতিয়ার করেছিলেন নরেন্দ্র মোদি। এর ফলে দেশের অর্থনীতির অসংগঠিত অংশ কিংবা সংখ্যাগরিষ্ঠ খেটে-খাওয়া মানুষের জীবনে কী ভয়ঙ্কর প্রভাব পড়তে পারে, সে সব চিন্তা মনের কোণেও ঠাঁই দেননি তিনি। নোট বাতিলকে প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, 'বেইমানদের বিরুদ্ধে ইমানদারদের লড়াই'। দেখা গেল, নোট বাতিলের মাধ্যমে আসলে ইমানদার জনসাধারণের সঙ্গেই বেইমানি করল বিজেপি সরকার। বাস্তবে এটাই হল জনবিরোধী একটি দক্ষিণপন্থী দলের সরকার ও তার নেতার প্রকৃত চরিত্র। নোট বাতিলের পাঁচ বছরে প্রধানমন্ত্রী সহ কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের কাছে এর জবাব দাবি করছেন জনসাধারণ।

বন্যা রোধ ও জলনিকাশির সমাধান চাই, দাবি কনভেনশনে

গত বর্ষায় পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কেলেঘাই নদীর বাঁধ ভেঙে ভগবানপুর-১ ও ২, পটাশপুর-১ ও ২, এগরা-১ ও ২, চণ্ডীপুর ব্লকের বিস্তীর্ণ অংশ বন্যা প্লাবিত হয়েছিল। এ ছাড়াও কোলাঘাট-শহিদ মাতঙ্গিনী-তমলুক-পাঁশকুড়া সহ বেশ কয়েকটি ব্লকের বিরাট এলাকা জলবন্দি হয়। জেলায় বন্যারোধে স্থায়ী ব্যবস্থা ও জলনিকাশি সমস্যা সমাধানের দাবিতে

২০ নভেম্বর মেচেদা বিদ্যাসাগর হলে জেলা কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক জয়মোহন পাল। মূল প্রস্তাব উত্থাপন করেন নারায়ণ চন্দ্র নায়ক। জেলার বিভিন্ন প্রান্তের ১৪টি গণকমিটি থেকে প্রায় দু'শতাধিক বানভাসি ও জলবন্দি মানুষ কনভেনশনে যোগ দেন। মূল বক্তব্য রাখেন অশোকতরু প্রধান।

সভায় ১০ দফা দাবি ও বিভিন্ন আন্দোলনের কর্মসূচি উত্থাপন করেন মধুসূদন বেরা। উৎপল প্রধানকে সভাপতি, নারায়ণ চন্দ্র নায়ক ও জগদীশ সাউকে যুগ্ম সম্পাদক করে ৩৭ জনের পূর্ব মেদিনীপুর জেলা বন্যা-ভাঙন প্রতিরোধ কমিটি গঠিত হয়। কমিটির যুগ্ম সম্পাদক বলেন, আগামী নভেম্বর মাসে রাজ্যের সেচমন্ত্রীর কাছে ডেপুটেশন এবং জেলা ও ব্লকস্তরে বিভিন্ন আন্দোলনের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।

রোকেয়া নারী উন্নয়ন সমিতির
বিডিও ডেপুটেশন

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার মগরাহাট, জয়নগর-২, মথুরাপুর-২— এই তিনটি ব্লকে স্বামী পরিত্যক্তা, বিধবা, তালাকপ্রাপ্তা ও বিভিন্ন ভাবে নির্যাতিতা নারীরা যাতে সরকারি প্রকল্পগুলির সুবিধা পান এবং সেগুলি যাতে দুর্নীতিমুক্ত হয় সেই দাবিতে রোকেয়া নারী উন্নয়ন সমিতির উদ্যোগে ১৬ থেকে ১৮ নভেম্বর জয়েন্ট বিডিও-র কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। তিনটি ব্লকেই প্রশাসন দাবি মেনে নেওয়ার আশ্বাস দেন। ওই ব্লকগুলির বিভিন্ন জায়গায় নারী নির্যাতন রোধে মহিলাদের নিয়ে আলোচনা সভা হয়। জয়নগর-২ এর চুপড়িঝাড়া অঞ্চলে কচিমোল্লার চকে, মথুরাপুর-২ এর কঙ্কনদিঘি অঞ্চলের পূর্বজটা সহ কয়েকটি গ্রাম নিয়ে এবং মগরাহাটে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। পরিচালনা করেন রাজ্য ইনচার্জ খাদিজা বানু।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21

জেএনইউ-তে নভেম্বর বিপ্লব বার্ষিকী পালন এআইডিএসও-র

১৭ নভেম্বর মহান নভেম্বর বিপ্লব বার্ষিকী স্মরণ করল এআইডিএসও জেএনইউ ইউনিট। মহান লেনিন-স্ট্যালিনের ছবিতে মাল্যদান, উদ্ধৃতি প্রদর্শনী

এবং এই সংক্রান্ত বইয়ের স্টল করা হয় জেএনইউ-এর সবরমতী ধাবাতে। সংগঠনের দিল্লি রাজ্য সভাপতি কমরেড প্রশান্ত কুমার উপস্থিত ছাত্রছাত্রীদের কাছে নভেম্বর বিপ্লবের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। সভা পরিচালনা করেন জেএনইউ-এর ছাত্রী এবং সংগঠনের রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড সুমন।

নভেম্বর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ১০৪তম বার্ষিকী উপলক্ষে কোচবিহার শহরে রক্ত পতাকা ও মহান লেনিন-স্ট্যালিনের ছবি নিয়ে পদযাত্রা। ১৭ নভেম্বর

নার্সেস ইউনিটির অনশন
মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের সংহতি

১৬ নভেম্বর এক প্রেস বিবৃতিতে মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের কলকাতা জেলা কমিটির সম্পাদক ডাঃ বিপ্লব চন্দ্র বলেন, বেতন বৈষম্য নিরসনের দাবিতে আন্দোলনে নেতৃত্বকারী নার্সদের বদলির প্রতিবাদে এসএসকেএম-এ নার্সদের অনশন মঞ্চে আমাদের একটি মেডিকেল টিম সংহতি জানাতে যায়। অনশনকারী সাতজন নার্সিং স্টাফের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার পরে দেখা গেল, দু'জনের শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়েছে। বেশ কয়েক জনের সুগার লেভেল কমতে শুরু করেছে। অথচ দেখা গেল, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ নার্সদের শারীরিক অবস্থার অবনতির কথা জানার পরেও কোনও মেডিকেল টিম পাঠায়নি। কর্তৃপক্ষ ও রাজ্য সরকারের এই হীন কার্যকলাপকে আমরা ধিক্কার জানাই। আমরা দাবি করছি, অবিলম্বে রাজ্য সরকারকে অনশনরত নার্সদের স্বাস্থ্যের সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিতে হবে এবং তাদের ন্যায়সঙ্গত দাবিগুলির দ্রুত সমাধান করতে হবে।

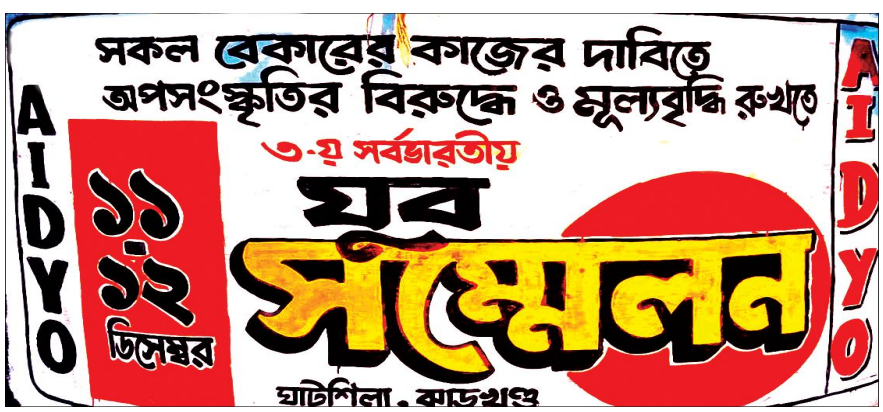

বিরসা মুণ্ডা স্মরণে উঠে এল আদিবাসী বঞ্চনার সুদীর্ঘ ইতিহাস

ভারতের আদিবাসী জনগণ ব্রিটিশ আমলের মতোই আজও অধিকার থেকে বঞ্চিত। ব্রিটিশ সরকার জঙ্গল ও জমির অধিকার থেকে আদিবাসীদের উচ্ছেদ করতে চাইলে বিরসা মুণ্ডার নেতৃত্বে অধিকার রক্ষার আন্দোলন শুরু হয়েছিল। সেই আন্দোলনের ফলেই ১৯০৮ সালে আদিবাসীদের জমি রক্ষার জন্য ছোটনাগপুর টেনেন্সি অ্যাক্ট চালু হয়েছিল। কিন্তু স্বাধীন ভারতে সরকার বার বার সংশোধন করে এই আইনের কার্যকারিতা সঙ্কুচিত করেছে। যেটুকু টিকে আছে তা বহু আন্দোলনের ফলেই টিকে আছে। আদিবাসী ও বনবাসীদের জঙ্গলের অধিকার রক্ষার উদ্দেশ্যে তৈরি 'ফরেস্ট রাইট অ্যাক্ট ২০০৬' দীর্ঘদিন ফাইলবন্দি করে রাখা হয়েছিল। সেটাও বহু আন্দোলনের ফলে চালু হয়েছে। কিন্তু শোষক শ্রেণি ও তার সরকার অন্যান্য অংশের মানুষের মতোই আদিবাসীদের অধিকার হরণের নানা ফন্দি করেই চলেছে। বর্তমানে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার জঙ্গল (সংরক্ষণ) আইন ১৯৮০-র সংশোধনী এনে আবারও গরিব ভূমিহীন আদিবাসীদের অধিকৃত জমি কেড়ে নেওয়ার পরিকল্পনা করেছে। এমনকী রায়তদের নিজেদের গাছ লাগানো জমির নিয়ন্ত্রণ সরকার হরণ করতে চলেছে।

এই প্রেক্ষাপটে গত ১৫ নভেম্বর ভারতের আদিবাসী ও বনবাসী মানুষরা পালন করলেন জমি রক্ষার আন্দোলনের অবিসংবাদী নেতা শহিদ বিরসা মুণ্ডার ১৪৭তম জন্মদিন। অল ইন্ডিয়া জন অধিকার সুরক্ষা কমিটি যথাযোগ্য মর্যাদায় দিনটি উদযাপনের আহ্বান জানায়। কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক বিসম্বর মুড়া বলেন, পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, বিহার ছত্তিশগড়, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট, ত্রিপুরা সহ বিভিন্ন রাজ্যে এ দিন বিরসা মুণ্ডার ছবিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানানো হয়। সর্বত্রই দাবি ওঠে—

১) ফরেস্ট (কনজারভেশন) অ্যাক্ট-১৯৮০ সংশোধনী বাতিল করতে হবে।
২) আদিবাসী ও বনবাসীদের রুটি-রুজির জন্য অধিকৃত জঙ্গলের জমির পাট্টা দিতে হবে।
৩) কোনও অবস্থাতেই দখলিকৃত জমি থেকে আদিবাসী ও বনবাসীদের উচ্ছেদ করা চলবে না।

কেশিয়াড়ি, পশ্চিম মেদিনীপুর

চাকদহ, নদিয়া

এ আই এম এস এস-এর কর্মশালা

মূল্যবৃদ্ধি, অতিমারি এবং মহিলাদের উপর নির্যাতন ও তার সমাধান শীর্ষক এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় ১৪ নভেম্বর কর্ণাটকের বাঙ্গালোরে। এআইএমএসএস-এর জেলা কমিটির পক্ষ থেকে দর্জি শ্রমিক,

আশা কর্মী, পরিচারিকা, গৃহবধূ এবং ছাত্রীদের নিয়ে এই কর্মশালায় শর্ট ফিল্ম দেখানো, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। সংগঠনের রাজ্য সভানেত্রী অপর্ণা বি আর সমাপ্তি বক্তব্য রাখেন।

বাঁকুড়ায় বিদ্যুৎ গ্রাহকদের বিক্ষোভ

জনবিরোধী বিদ্যুৎ বিল সংশোধনী-২০২১ বাতিল, বিদ্যুতে বেসরকারিকরণ বন্ধ, অন্যান্য রাজ্যের মতো এ রাজ্যে বিদ্যুতের মাশুল কমানো, ছাতনার পায়সাবাদে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে মৃত দিনমজুরের পরিবারকে কমপক্ষে ১০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ প্রভৃতি দাবিতে ২০ নভেম্বর বাঁকুড়া রিজিওনাল ম্যানেজারের অফিসের সামনে আইনের প্রতিলিপি পুড়িয়ে বিক্ষোভ দেখানো হয় ও স্মারকলিপি দেওয়া হয়। বক্তব্য রাখেন গোবিন্দ ঘোষ, তারাপদ গরাই, গুণময় ব্যানার্জী, হরিদাস ব্যানার্জী, জেলা সম্পাদক স্বপন নাগ প্রমুখ।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com